জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

আরএসএসকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চাননি গোলওয়ালকর

—অপরেশ ভৌমিক—

সমাজ তথা রাষ্ট্রের হিতে সতত নিয়োজিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আর এস এস) দ্বিতীয় সরসংঘচালক অর্থাৎ সংগঠনের সর্বোচ্চ প্রধান মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের জন্মশতবার্ষিকী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ থেকে সারা দেশে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপিত হতে চলেছে।

১৯০৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের জন্ম হয়। মাধবের পিতার নাম সদাশিব রাও এবং উনি পেশায় ছিলেন স্কুলশিক্ষক। চাকরি সূত্রে মাধবের পিতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দিভাষী এলাকায় বদলি হতেন। তাই মাতৃভাষা মারাঠি হওয়া সত্ত্বেও সর্বসাধারণের মধ্যে হিন্দি ভাষার প্রচলন বেশি থাকার জন্য মাধব ছোটবেলা থেকে হিন্দি ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া বাল্যকালে নিজের পড়াশোনা মিশনারি স্কুলে করার সুবাদে ইংরেজিতেও মাধবের খুব ভাল দখল হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে ১৯২৪ সালে নাগপুর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম স্থান দখল করেন। অর্থাৎ ওই পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উনিই ইংরেজিতে সর্বাধিক নম্বর পান।

নাগপুর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর মাধব ১৯২৪ সালেই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি কোর্সে ভর্তি হন এবং বিএসসি পাশ করার পর সেখানেই এমএসসি কোর্সে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রাণীবিদ্যায় এমএসসি পাশ করেন।

এমএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাধবের উচ্চশিক্ষা লাভের খুব ইচ্ছা ছিল। তাই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে মাধব তৎকালীন মাদ্রাজ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দেন। কিন্তু সে সময় ১৯২৯ সালে পিতা সদাশিব রাওয়ের চাকরি থেকে অবসর প্রাপ্তির জন্য পরিবারে আর্থিক অনটন দেখা দেয় এবং বাধ্য হয়েই মাদ্রাজ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে নাগপুরে ফিরে এসে চাকরির সন্ধান করেন। অবশ্য কয়েকমাসের মধ্যেই মাধব বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুবাদে ছাত্রদের সঙ্গে মাধবের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা, ওদের প্রতি সহমর্মিতা এবং আন্তরিকতা এমন এক পর্যায়ে যায় যে, তখন মাধবের সংস্পর্শে যে সকল ছাত্ররা এসেছিল ওরা সবাই ওকে গুরুজি বলে ডাকতেন। তখন থেকেই মা-বাবার আদুরে নাম মধু এবং পোশাকি নাম মাধব সকল প্রিয়জনদের কাছে গুরুজি হয়ে যায়।

সে সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের নির্দেশে নাগপুরের এক স্বয়ংসেবক ভাইয়াজি দানী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভর্তি হন। সেই ভাইয়াজি দানীই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে শ্রীগুরুজিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংস্পর্শে আনেন। কিন্তু শ্রীগুরুজি বেশিদিন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যেতে পারেননি। যে পদে উনাকে নিয়োগ করা হয়েছিল সেটার সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আবার নাগপুরে চলে যান। নাগপুরে আইন কলেজে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে এলএলবি পাশ করেন।

এই সময়টাতেই মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের মনে নানা রকমের ঝড় বইতে থাকে। একদিকে দেশের পরাধীনতার বেদনা এবং হিন্দু সমাজের ঘোর দুর্দশা ওর সংবেদনশীল হৃদয়কে তোলপাড় করত অপরদিকে আধ্যাত্মিক পিপাসাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আধ্যাত্মিক পিপাসা ওকে টেনে নিয়ে যায় নাগপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দজির কাছে। সেখানে মিশনের আরেক মহারাজ অমিতাভজির সঙ্গে মাধবের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ওদের কাছ থেকে মাধব স্বামী অখণ্ডানন্দজির কথা শুনেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই। সে সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি আশ্রমে থাকতেন। অমিতাভ মহারাজের কথামত কোনও সদগুরুর পদপ্রান্তে বসে মোক্ষলাভের জন্যে শ্রীগুরুজি ১৯৩৬ সালে মা-বাবাকেও কিছু না জানিয়ে সোজা চলে যান সারগাছি আশ্রমে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারও সে খবর জানতে পারেননি। তিনি সে সময় শ্রীগুরুজিকে সংঘের কাজে পাওয়ার জন্যে আগ্রহান্বিত ছিলেন। শ্রীগুরুজির অন্তর্ধানের জন্য মাধবের মা-বাবার মত ডাক্তারজিও খুব ব্যথিত হয়েছিলেন।

সারগাছি আশ্রমে গিয়ে শ্রীগুরুজি স্বামী অখণ্ডানন্দজির সেবায় নিজের দেহ মন একান্তভাবে নিয়োজিত করেন। আশ্রমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থেকে আরম্ভ করে স্বামীজির কাপড় ধোয়া, খাবারের ব্যবস্থা করা, বাসন মাজা, বিছানা ঠিক করা প্রভৃতি তাঁর নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়। স্বামীজি বৃদ্ধ ও শারীরিক অসুস্থ ছিলেন। প্রায় পাঁচ-ছ'মাস অধিকাংশ সময় গুরুজি নিষ্ঠা সহকারে স্বামীজির সেবা করে যান। অবশেষে ১৯৩৭ সালের ১৩ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন স্বামী অখণ্ডানন্দজি শ্রীগুরুজিকে দীক্ষা দেন। গুরু মহারাজ দীক্ষাদানের পর শ্রীগুরুজিকে আশীর্বাদ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমার মধ্যে যা কিছু শুভ সব তোমাকে সমর্পণ করছি, আর তোমার যা কিছু অশুভ তা আমাকে দাও।' সেদিন স্বামীজি শ্রীগুরুজি এবং অমিতাভ মহারাজকে পাশে বসিয়ে রাত সাড়ে তিনটা অবধি আধ্যাত্মিকতার গূঢ় তত্ত্ব শোনান।

শ্রীগুরুজিকে দীক্ষাদানের পর স্বামী অখণ্ডানন্দজি আর বেশিদিন দেহধারণ করে থাকেননি। মাত্র একমাস সময়সীমার মধ্যেই ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যান। মৃত্যুর পূর্বে স্বামীজি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নিজের কমণ্ডলু ও অন্য কিছু ব্যবহার্য বস্তু শ্রীগুরুজিকে দেন এবং একদিন তিনি অমিতাভ মহারাজকে ডেকে বলেন, 'আমার এরকম মনে হচ্ছে যে, গোলওয়ালকর ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে থেকেই কাজ করবে।'

স্বামী অখণ্ডানন্দজির দেহত্যাগে শ্রীগুরুজি অত্যন্ত ব্যথিত হন। দেহত্যাগের পর কিছুদিন দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে থেকে তিনি অমিতাভ মহারাজের সঙ্গে নাগপুরে ফিরে যান।

মাতৃভূমিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে যৌবনে অনেকেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরবর্তীতে আধ্যাত্মিকতার আবেষ্টনীতে নিজেকে আবদ্ধ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছেন— এমন ঘটনা বিরল নয়। বিপ্লবী অরবিন্দ হয়েছেন ঋষি অরবিন্দ। কিন্তু সন্ন্যাস জীবনের পথ থেকে ফিরে এসে নিজেকে দেশমাতৃকার সেবাকার্যে নিয়োজিত করার অনন্য ঘটনা কেবল মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের জীবনেই দেখা যায়। নাগপুরে এসে ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে এবং সত্যি-সত্যিই গুরু অখণ্ডানন্দজীর ভাবনা মত ডাক্তারজির নির্মল ও রাষ্ট্র সমর্পিত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ১৯৩৮ সালের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজকেই জীবনের একমাত্র কাজ বলে মাধব গোলওয়ালকর স্বীকার করে নেন।

সংঘ জীবনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করার পর শ্রীগুরুজি মাত্র তিন বছরেরও কম সময়সীমা পর্যন্ত সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সান্নিধ্যে ছিলেন। এই অল্প পরিসরেই ডাঃ হেডগেওয়ার শ্রীগুরুজির সাংগঠনিক কর্মকুশলতা, নৈপুণ্য এবং দূরদর্শিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংঘ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে ডাঃ হেডগেওয়ারের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। চিকিৎসকদের কথাবার্তা এবং চিকিৎসা পদ্ধতি দেখে ডাক্তারজি বুঝতে পারেন যে উনার সময় শেষ হয়ে আসছে। তাই তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের সামনে শ্রীগুরুজিকে ডেকে বললেন, 'ভবিষ্যতে সংঘকার্যের সমস্ত দায়িত্ব আপনার। সবকিছুই আপনাকে দেখতে হবে।' ১৯৪০ সালের ২১ জুন ডাক্তারজির জীবাত্মা পার্থিব দেহত্যাগ করে অনন্তলোকে বিলীন হয়ে যায়। ডাক্তারজির দেহাবসানের পর তাঁর ইচ্ছানুসারেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালকের গুরুদায়িত্ব শ্রীগুরুজির উপর ন্যস্ত করা হয়।

সংঘের সর্বভারতীয় প্রমুখ হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করার পর বিভিন্ন সময়ে জাতীয় জীবনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোর মোকাবিলায় এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুজি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। গুরুজি দেশকে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে বিভাজিত করে ব্রিটিশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছিলেন। দেশের সর্বত্র তিনি তখন দেশ বিভাজনের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে করতে প্রস্তুত ছিলেন না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শ্রীগুরুজি দেশ বিভাজনকে কখনই সমস্যার সমাধান বলে মনে করেননি। মাতৃভূমির খণ্ডিতরূপ পুনঃসংহত হয়ে পুনরায় অখণ্ড করার দৃঢ় প্রত্যয় দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত হোক, এটাই ছিল তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। দেশ বিভাজনের অভাবহ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান থেকে আসা লক্ষাধিক উদ্বাস্তু অস্থায়ী আবাস, খাদ্যের ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কঠিন কাজ শ্রীগুরুজির নেতৃত্বে স্বয়ংসেবকরা করেছে।

দেশ বিভাজনের কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যে পাক সেনারা আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা কাশ্মীরের এলাকা দখল করতে থাকে। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং তখন দ্বিধাগ্রস্ত। সে সময় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি মাধব সদাশিব রাও গোলওয়ালকরকে কাশ্মীরে পাঠান মহারাজের সঙ্গে আলাপ করে কাশ্মীরকে ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য। শ্রীগুরুজি কাশ্মীরে পৌঁছালে মহারাজা হরি সিং এবং মহারানি কাশ্মীরি শাল দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। ১৯৪৭ সালের ১৮ অক্টোবর মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য রাজি করান। তারপর ভারতীয় সেনারা কাশ্মীরে গিয়ে পাক সেনার দখল থেকে এলাকামুক্ত করে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ এলাকামুক্ত করার আগেই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন এবং রাষ্ট্রসংঘে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকাকে একটি সম্পূর্ণ আত্মঘাতী কাজ বলে শ্রীগুরুজি তখন মন্তব্য করেছিলেন এর ফল আমাদের ভালোর পরিবর্তে খারাপ হবে। সত্যি সত্যি হলও তাই।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি জাতীয় জীবনের একটি দুঃখের দিন। সেদিন বিকাল পাঁচটায় জনপ্রিয় নেতা মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই খবর পাওয়া মাত্রই শ্রীগুরুজি নিজের নির্ধারিত কার্যক্রম বাতিল করে নাগপুরে ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও সর্দার প্যাটেলকে এক শোকবার্তায় বলেন, 'গান্ধীজি শান্তিকামী মানুষ ছিলেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সঠিকপথে পরিচালনা করার মত ব্যক্তি তিনিই একমাত্র ছিলেন। তাঁর হত্যাকারী রাষ্ট্রের কাছে এক অমার্জনীয় অপরাধ করেছে।' এভাবে শ্রীগুরুজি গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর হত্যাকারীকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করার পরও সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকেও গান্ধী হত্যার অপরাধী সন্দেহে অভিযুক্ত করে। ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সরকার সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর শ্রীগুরুজি স্বয়ংসেবকদের সংঘের কার্যকলাপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। সরকারি নির্দেশনামায় গান্ধী হত্যা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার হিংসা ও ষড়যন্ত্র করা ইত্যাদি নানা অভিযোগ শ্রীগুরুজির বিরুদ্ধে আনা হয়। সরকারি প্রচারযন্ত্র ও প্রচারমাধ্যমে ক্রমাগত সংঘের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও বদনাম রটানোর কাজ চালিয়ে যায়। সারা দেশজুড়ে স্বয়ংসেবকদের গ্রেফতার করে। শ্রীগুরুজিকেও বন্দি করে সিওনি জেলে আটক রাখেন।

সংঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে শ্রীগুরুজি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। উপরন্তু সরকার পক্ষ থেকে দমন-পীড়ন বাড়তে থাকে। যখন শ্রীগুরুজি দেখলেন যে, সংঘের পক্ষ থেকে সবরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করার পরও ক্ষমতালোভী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায়-নীতির বালাই নেই তখন তিনি স্বয়ংসেবকদের রাষ্ট্রজীবনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় সংঘকার্য শুরু করার আহ্বান জানান। তখন শ্রীগুরুজি স্বয়ংসেবকদের বলেছিলেন, 'যুদ্ধ আসন্ন, এ যুদ্ধ অধর্মের সঙ্গে ধর্মের, অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের, বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে শুদ্ধতার এবং দুষ্ট শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত, কেননা ধর্মের সঙ্গে ভগবান থাকেন। যেখানে ভগবান সহায় সেখানে বিজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং ওঠো, ভূম্যাকাশ থেকে জলাকাশ পর্যন্ত ভারতমাতার জয়ধ্বনিতে ভরে তোলো। কার্যপূর্তির দিকে এগিয়ে চলো।'

শ্রীগুরুজির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর সারা দেশে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম ও শহর থেকে স্বয়ংসেবকরা সত্যাগ্রহে যোগদান করে কারাগার ভর্তি করতে থাকে। সরকারি তথ্য অনুসারে ৭৭ হাজার ৯০ জন দেশের বিভিন্ন জেলে কারাবরণ করে।

সে সময় একদিকে পুলিশের অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার এবং অপরদিকে স্বয়ংসেবকদের সৌজন্যবোধ, অনুশাসন এবং নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে দেশের বিবেকবান জনসাধারণ ব্যথিত এবং সচেতন হতে থাকে। সরকার বুঝতে পারে যে, তাদের অন্যায় আচরণ ক্রমে ক্রমে জনতার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তখন সরকার সংঘকে লিখিত সংবিধান গ্রহণ করার অজুহাত দেখিয়ে নিঃশর্তে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। গান্ধী হত্যা সহ আরও যতরকম অন্যায় অভিযোগ করেছিল তার সঙ্গে সংঘের কোনওরকম সম্পর্কই ছিল না।

সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর শ্রীগুরুজি সহ সব স্বয়ংসেবকদের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে বেরোনোর পর দিল্লিতে শ্রীগুরুজিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা সভায় বিশাল জনসমাগম দেখে বিবিসি প্রচার করেছিল, 'শ্রীগুরুজি ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এত বড় জনপ্রিয়তা ভারতে আর কেবল পণ্ডিত নেহরুর রয়েছে।'

সরকার কর্তৃক সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং গান্ধী হত্যা অভিযোগে নিষ্কলঙ্ক হয়ে বেরিয়ে আসার পর শ্রীগুরুজি সারা দেশব্যাপী ভ্রমণের কার্যসূচি গ্রহণ করেন। সংঘের কাজ নবোদ্যমে এগিয়ে চলে। তখন শুধু এগিয়ে চলা আর এগিয়ে চলা।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জনসংঘকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য শ্রীগুরুজির সহায়তা চাইলেন। তখন শ্রীগুরুজি দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, নানাজি দেশমুখের মত সংঘের প্রমুখ প্রচারকদের জনসংঘে কাজ করার অনুমতি দেন। কিন্তু গুরুজি তখন তাঁদের স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে রাজনীতিতে জড়ানো যাবে না। কেননা সংঘ কোনও রাজনৈতিক দলের অধীনে থেকে কাজ করতে পারে না। সংঘের মূল কাজ হল রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত করা।' ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সংঘের এই ভূমিকাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তিনি এটাও বলেন যে তিনি হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শে সম্পূর্ণ একমত।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন অধ্যাত্মনির্ভর সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রীয়তার বাণী বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৬৩ সালের মকর সংক্রান্তির দিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতাব্দী পালনের শুভ মুহূর্তে কন্যাকুমারীর দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রের মধ্যে শ্রীপাদ শিলাখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শ্রীগুরুজি তখন সংঘের সরকার্যবাহ একনাথ রানাডেকে এই কঠিন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। একনাথ রানাডে এই দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। বর্তমানে সমগ্র দেশবাসীর কাছে রাষ্ট্রীয় একতা এবং অখণ্ডতার এক জ্বলন্ত প্রেরণাকেন্দ্রস্বরূপ এই স্মারক বিরাজমান।

সংঘের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ছাড়া জাতীয় জীবনের অনেক ব্যাপারে শ্রীগুরুজির ভূমিকা ছিল উল্লেখনীয়।

১৯৪০ সালের শেষার্ধ থেকে ১৯৭৩ সালের ৫ জুন গুরুজির দেহত্যাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিন দশকেরও কিছু অধিক সময় তিনি সংঘের সরসংঘচালক অর্থাৎ সর্বভারতীয় প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব নির্বাহ করে গেছেন। ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্রকে বৈভবশালী করার জন্য সংগঠনের যে চারা রোপণ করে গিয়েছিলেন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গুরুজির সঠিক নেতৃত্বে এক বিরাট মহীরুহে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। আজ সংঘকেন্দ্রিক আরও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সংঘের স্বয়ংসেবকরা কাজ করে যাচ্ছে। শ্রীগুরুজি সংঘের পরিবারকে বিশ্বব্যাপী করেছে। শ্রীগুরুজির দেহাবসানের পর তাঁর স্মরণে বিভিন্ন সাধু-সন্ত ও নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

আচার্য বিনোবা ভাবে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন, 'শ্রীগুরুজির মধ্যে বিন্দুমাত্র সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি সর্বদা শুদ্ধ জাতীয় ভাবধারায় কাজ করতেন। তিনি মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের মানুষকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং আশা করতেন ভারত থেকে যেন কেউ আলাদা না হয়ে যায়।' পুরীর জগদগুরু শঙ্করাচার্য বলেন, 'শ্রীগুরুজি সাদা কাপড়ের এক সন্ন্যাসী ছিলেন।' জৈন আচার্য মুনি সুশীলকুমার বলেছেন, 'শ্রীগুরুজি সংস্কৃতির এক মহামানব ছিলেন।' তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'সংসদ সদস্য নন একরকম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গোলওয়ালকর আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, দেশের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। নিজের ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠার জন্য জাতীয় জীবনে তাঁর এক মহত্ত্বপূর্ণ স্থান ছিল।'

নেতাজি ভক্ত সমর গুহ বলেছেন, 'তিনি জাতীয় কাজে দেশভক্তি, সমর্পণ এবং সেবার ভাব হাজার হাজার তরুণের মনে সঞ্চারিত করেছেন।' কংগ্রেস নেতা হাফিজুদ্দিন কুরেশি বলেছেন, 'তিনি বাস্তবে মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কখনও মুসলিম-বিরোধী ছিলেন না। মুসলিম বিরোধিতার নামে এখনও মুসলমানদের সংঘের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়া হয়ে থাকে।' জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন, 'শ্রীগুরুজি এক আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি হাজার হাজার নব যুবককে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধে প্রেরণা দিয়েছেন।'

তথ্যসূত্র: শ্রীগুরুজী—এইচ ভি শেষাদ্রি